বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ১৭৯-১৯০
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

প্রবীণ জনগোষ্ঠী ও নারীর ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব: উত্তরণের উপায়

মনজু আরা বেগম*

সারসংক্ষেপ *কোভিড-১৯ পৃথিবীর ইতিহাসে একটি মারণঘাতি ভাইরাস। এ ভাইরাসে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। বিশেষ করে প্রবীণ ও নারী জনগোষ্ঠীর ওপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। ২০২০ সালের মার্চ মাসে এটি বাংলাদেশে দেখা দেয়। করোনার প্রভাবে স্বাস্থ্যখাতের দুরবস্থা, দুর্নীতি, সরকারি প্রণোদনা প্যাকেজ বিতরণের অব্যবস্থা, প্রবীণ নারী ও পুরুষের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কিছুটা তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়াও সমাজে প্রবীণদের সম্মানজনক অবস্থান না থাকায় তাদের নির্যাতিত ও বিপর্যস্ত জীবনের ওপর সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোকপাত ও করোনার প্রভাব থেকে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও উত্তরণের সুপারিশ-পরামর্শ রয়েছে।*

ভূমিকা

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দীতে আমরা অন্যরকম এক বাংলাদেশকে দেখছি। যে বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে মাথা উচুঁ করে বেঁচে থাকার এক বাংলাদেশ। যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। আমাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটেছে। আমাদের মাথাপিছু আয়, গড় আয়ু, সার্বজনীন শিক্ষা, শিশুমৃত্যুর হার, কৃষি, শিল্প, অবকাঠামো বিদ্যুৎ, প্রযুক্তি, প্রবাসী আয় ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশ এগিয়ে গেছে এবং যাচ্ছিল অবিরত। ফলে বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ১৯৭১ থেকে ২০২১ সময়ে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি। বাংলাদেশের অর্থনীতি সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে দ্বিতীয় ও বিশ্বে ৪১তম স্থান করে নিয়েছে। আমাদের দারিদ্র্যের হার ২০০৭ সালে ছিল ৪৩ শতাংশ। বর্তমানে তা ২০ শতাংশেরও নিচে। আমাদের স্বাধীনতার মূলমন্ত্রই ছিল দেশের মানুষের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তি, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা থেকে মুক্তি, মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আমাদের এ অর্জনকে কিছুটা হলেও ম্লান করে দিয়েছে কোভিড-১৯ নামক এক মারণঘাতি ভাইরাস। বিজ্ঞানী তথা গবেষকদের মতে, আগামী ২০২৪

* সাবেক মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন; কলামিস্ট। ই-মেইল: monjuara2006@yahoo.com

সাল পর্যন্ত এ ভাইরাস চলতে পারে। করোনা নিয়ন্ত্রণে রাখার এখন পর্যন্ত একমাত্র উপায় হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও ভ্যাকসিন গ্রহণ। যদিও ভ্যাকসিন তেমন একটা কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ এ ভাইরাসের রূপ বা গতিপ্রকৃতি খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। এ ভাইরাস যে শুধু আমাদের দেশে বা আমাদের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলেছে, তা নয়। বিশ্বজুড়ে পড়েছে এর ক্ষতিকর প্রভাব। ক্ষুদ্র এ ভাইরাসের কাছে বিশ্বের বড় বড় পরাশক্তিধররাও নতজানু হয়ে পড়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে ছড়িয়ে পড়া প্লেগ মহামারির পর এই কোভিড-১৯ মহামারি মানুষের জীবন এবং অর্থনীতির ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। দুঃখজনক বিষয় হলো গত দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বজুড়ে চলা কোভিডের কারণে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অনেক শ্লথ হয়ে গেছে। মোট দেশজ উৎপাদনের মৌলিক খাত কৃষি, শিল্প ও সেবা এই তিনটি খাতের মধ্যে শিল্প ও সেবা এ দুটি খাত স্থবির হয়ে গিয়েছিল। জিডিপিতে এ দুটি খাতের অবদানই প্রায় ৮৩ শতাংশ। কৃষি খাতের উৎপাদন অব্যাহত থাকলেও পরিবহন সংকটে পণ্যের বিপণন স্বাভাবিক না থাকায় করোনার ধাক্কায় অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি স্বাভাবিক ছিল না। ব্যবসাবাণিজ্য ছিল স্থবির। করোনা মোকাবিলায় ব্যবসায়ীদের জন্য যে প্রণোদনা প্যাকেজ দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো সুষ্ঠুভাবে বণ্টন হয়নি। ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে বাংলাদেশে এই সংক্রমণ ধরা পড়ে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ২০২০-এর ১১ মার্চ হতে কোভিড-১৯ কে মহামারি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ ভাইরাসটি স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বের ১৮৫টি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এত মারাত্মক আকার ধারণ করে যে বিশ্বের বড় বড় অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশগুলোতেও এর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব জনজীবনকে বিপন্ন করে তোলে। কোভিড-১৯ মানব ইতিহাসে বিশ্বে ভয়াবহতম একটি ভাইরাস হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই মহামারিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এই ভাইরাস পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে জনজীবনকে বিচ্ছিন্ন এবং পঙ্গু করে দেয়। সরকার লকডাউন ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। দীর্ঘ সময় ধরে লকডাউন চলার কারণে দোকানপাট শিল্প-কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানিসহ বহির্বিশ্বের সাথে সবধরনের যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় অর্থনীতিতে স্থবিরতা নেমে আসে। কোভিডের ভয়াবহতা নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত হয়ে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। প্রতিদিন মৃত্যুর মিছিল দেখতে দেখতে গৃহবন্দী মানুষ ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়েছে। এই ভাইরাস রক্তের সম্পর্কগুলোকে ম্লান করে দিয়েছে। হাসপাতালে উপচেপড়া রোগীর ভীড় জীবনের গতিকে থেমে দিয়েছে। ভয়ে-আতঙ্কে মা-বাবা সন্তানের কিংবা সন্তান মা-বাবার মৃত্যুসংবাদ শোনার পরও দেখতে যায়নি বা দাফন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়নি। কোনো হাসপাতালেই তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। করোনা আক্রান্ত রোগীকে এ হাসপাতাল থেকে সে হাসপাতাল করতে করতেই কতজন যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, সে হিসাব করতে গেলে এখনও গা শিহরে ওঠে। দীর্ঘ সময় ধরে লকডাউন দিয়ে, মুখে মাস্ক পড়ে, সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে, হাটবাজার এড়িয়ে চলে ভ্যাকসিন দিয়ে সবরকম স্বাস্থ্যবিধি মেনেও কোনো পার পাওয়া যায়নি। এই নৃশংতম ভয়াবহ দিনগুলো আমরা ধীরে ধীরে কিছুটা হলেও কেটে উঠছি। জানি না এটি কতদিন কাটাতে পারব। শোনা যাচ্ছে আসছে শীতে আমাদের দেশে করোনার তৃতীয় ঢেউ আবার বাড়বে। ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে এরই মধ্যে করোনা 'অমিক্রন' নাম ধারণ করে তীব্রভাবে হানা দেওয়া শুরু করেছে। শুরু হয়েছে আবার লকডাউন। লকডাউনের কারণে জনজীবন স্থবির হয়ে যাচ্ছে। অফিস-আদালত, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা একসময় বন্ধ হয়ে যায়। জীবন হয়ে ওঠে ওষ্ঠাগত।

অর্থনৈতিক প্রভাব

কোভিড-১৯ এর সংক্রমণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দারুণ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। এ সময়ে শ্রমবাজারে নতুন করে আসা কর্মীদের যেমন চাকরির সুযোগ ঘটেনি, তেমনি আগের চাকরিজীবীদের অনেকেই চাকুরিচ্যুত হয়েছেন। পত্রিকার তথ্যানুসারে সব মিলিয়ে এই সময়ে বেকারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৩ লাখ। (দৈনিক যুগান্তর ০৯.১০.২১)। এই বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য যেভাবে বিনিয়োগ দরকার, সেভাবে বিনিয়োগ বাড়ছে না। গত সেপ্টেম্বরে বিশ্বব্যাংকের সহযোগী সংস্থা আইএফসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনার কারণে অর্থনীতি যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে সময় লাগবে। করোনার পূর্বে বাংলাদেশে মোটামুটি একটি স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছিল, যা দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করতে সহায়তা করছিল। ২০১৯ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.২ শতাংশ। করোনার কারণে ২০২০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৩.৮ শতাংশে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক জরিপে দেখা গেছে, করোনা ভাইরাসের কারণে দেশে পরিবারপ্রতি গড়ে ৪ হাজার টাকা করে আয় কমে গেছে। বিবিএসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫০ লক্ষেরও বেশি মানুষ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মে নিয়োজিত, যা মোট জনশক্তির প্রায় ৮৫.১ শতাংশ। করোনার কারণে প্রায় ৮০ শতাংশ দিনমজুর কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছেন।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. আবুল বারকাতের সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত এক গবেষণায় জানা যায়, দেশে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে ৬ কোটি ৮২ লাখ ৮ হাজার মানুষ কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। শুধু করোনায় লকডাউনের কারণে কর্মহীন হয়েছেন ৩ কোটি ৫৯ লাখ ৭৩ হাজার ২৭১ জন। অর্থাৎ মোট কর্মক্ষম মানুষের ৫৯ শতাংশই কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষ বেকার হয়েছেন সেবাখাতে। বিবিএসএর হিসাবে প্রতিবছর গড়ে শ্রমবাজারে যুক্ত হয় ২৪ লাখ ৩৪ হাজার মানুষ। এ হিসাবে গত দেড় বছরে শ্রমবাজারে এসেছে সাড়ে ৩৬ লাখ মানুষ। করোনার কারণে সরকারি চাকরিতে যেমন কর্মসংস্থান হয়নি, তেমনি বেসরকারি খাতেও তেমনভাবে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। ফলে ওই সাড়ে ৩৬ লাখের মানুষের বেশির ভাগই বেকার। এর সাথে নতুন করে কাজ হারানোর তালিকায় আছে ১৬ লাখ ৭৫ হাজার মানুষ। সরকারি হিসাবেই দেখা যায়, শুধু করোনাকালীন বেকারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩ লাখ। সরকার করোনার প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ১০ কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হলেও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রায় ৩৫ লাখ পরিবারকে ২ লাখ ৫০০ টাকা করে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ১ লাখ কৃষক পরিবারকে ৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদানের কথাও জানা যায়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে করোনার আঘাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির এই বাজারে আড়াই হাজার টাকা দিয়ে একটি পরিবারের কতদিন চলবে? এ ছাড়া আছে চিকিৎসা ব্যয়, বাড়িভাড়াসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়। বিবিএসের তথ্যানুসারে গত নভেম্বরে সামগ্রিক মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে হয়েছে ৫.৯৮ শতাংশ, যা গত অক্টোবরে ছিল ৫.৭০ শতাংশ। মূল্যস্ফীতির এই হার জনজীবনে বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষকে চরম দুর্দশায় ফেলেছে। অবশ্য মূল্যস্ফিতির এই হার সারা বিশ্বেই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খোদ যুক্তরাষ্ট্রে বিগত ৪৯ বছরের মধ্যে মূল্যস্ফীতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়েছে। হঠাৎ করে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি এর কারণ হতে পারে। করোনা ছাড়াই বাজারে প্রতিটি দ্রব্যের এমনিতেই মূল্যবৃদ্ধি ছিল। তার সাথে যোগ হয়েছে করোনার প্রভাব। এসব ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে

স্বল্প আয়ের মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। এ ভাইরাসের কারণে অনেকে চাকরি হারিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। দারিদ্র্য বেড়েছে। গরিবরা আরও গরিব হয়েছে। করোনার আঘাতে নতুন করে আড়াই কোটি মানুষ দরিদ্র হয়েছে এবং বেকার হয়েছে প্রায় কয়েক লক্ষ মানুষ। এ কারণে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বাড়ানো হয়েছে। জানা যায়, ২০২১-২২ অর্থ বছরে নতুন করে ৫৭ লাখ বয়স্ক মানুষকে বয়স্ক ভাতা দেওয়া হবে। বর্তমানে ৮৯ লাখ মানুষকে বয়স্ক ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

আইএলও থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা ৩ কোটি। করোনার কারণে তা দ্বিগুণ হয়ে ৬ কোটিতে দাঁড়াতে পারে। তাদের হিসাবে আগামী ২০২৩ সাল পর্যন্ত শ্রমেরবাজারে করোনার প্রভাব থাকবে। এতে করে কাজ হারানোর সংখ্যা আরও বাড়বে। কমবে নতুন কর্মসংস্থান। ফলে বাড়বে দারিদ্র্য। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার এন্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) ও ব্রাক ইন্সটিটিউট অব গর্ভন্যান্স এন্ড ডেভলপমেন্টের এক জরিপে বলা হয়, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরুর আগে গত মার্চে নতুন দরিদ্রের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৪৫ লাখ। সানেমের গবেষণায় বলা হয়, ২০১৯ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষের সংখ্যা ছিল ২০.৫ শতাংশ। করোনার কারণে এ হার বেড়ে প্রায় ৪১ শতাংশে। সিপিডির তথ্যানুসারে করোনায় ১ কোটি ৬৪ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছে, যাদের অধিকাংশই শ্রমজীবী। করোনার ক্ষতি মোকাবিলা করতে সরকার বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজসহ বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও সেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, করোনাকালে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির থাকলেও বিগত ১ বছরে দেশে নতুন কোটিপতির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজারে। জানা যায়, ১৯৭২ সালে দেশে কোটিপতি আমানতকারী ছিল মাত্র ৫ জন। ১৯৭৫ সালে ৪৭ জন, ১৯৮০ সালে ৯৮ জন, ১৯৯০ সালে ৯৪৩ জন, ১৯৯৬ সালে ২ হাজার ৫ শত ৯৪ জন, ২০০১ সালে ৫ হাজার ১৬২ জন, ২০০৬ সালে ৮ হাজার ৮৮৭ জন, ২০০৮ সালে ১৯ হাজার ১৬৩ জন। (১৩.১০.২১ দৈনিক যুগান্তর)। এ তথ্য থেকে বোঝা যায়, করোনার প্রভাবে দারিদ্র্যের হার বাড়লেও ধনীক শ্রেণির সংখ্যাও সমহারে বেড়েছে অর্থাৎ এই সময়ে ধনীরা আরও ধনী হয়েছে। ফলে শ্রেণি বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করেছে। দেশের অর্থনীতির আকার বড় হলেও আয়ের ক্ষেত্রে রয়েছে বিরাট বৈষম্য। করোনা মহামারি চলাকালীন বিশ্বে ধনী-গরিব বৈষম্য বেড়েছে। দ্য ওয়ার্ল্ড ইনইক্যুয়ালিটি রিপোর্ট এ বলা হয়েছে ২০২০ সালে বিশ্বে ধনকুবেরদের সম্পদের পরিমাণ রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্যারিসভিত্তিক ওয়ার্ল্ড ইনইক্যুয়ালিটি ল্যাবের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১০ শতাংশ ধনীর হাতে কুক্ষিগত হয়েছে ৭৬ শতাংশ সম্পদ। এই সময়ে অতিরিক্ত ১০ কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্যে ডুবে গেছে। অন্যদিকে নিম্ন আয়ের ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে বৈশ্বিক আয়ের মাত্র ৮ শতাংশ সম্পদ। গবেষণা প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বিশ্বের ৫২ জন ধনী ব্যক্তির সম্পদ গত ২৫ বছরে বেড়েছে ৯.২ শতাংশ। চলতি বছর অতিধনীদের পারিবারিক সম্পদের সম্মিলিত পরিমাণ বেড়ে বৈশ্বিক সম্পদের ৩.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা ২০২০ সালে করোনা শুরুর পূর্বে ছিল ২ শতাংশের কিছু বেশি। এশীয় উন্নয়ন ব্যংকের (এডিবি) প্রকাশিত এক গবেষণাপত্র অনুযায়ী, উন্নয়নশীল এশীয় দেশগুলোতে পর্যটন, ভ্রমণ ও দেশীয় বাণিজ্য খাতে উৎপাদন মারাত্মক হ্রাস পেয়েছে। গবেষণাপত্রের অনুমান, এই মহামারিতে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্ভাবনা ৭৭ বিলিয়ন ডলার থেকে ৩৪৭ বিলিয়ন ডলার, যা বিশ্বব্যাপী মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ০.১ শতাংশ থেকে ০.৪ শতাংশ। (এডিবি-২০২০)। মহামারি চলাকালীন এশিয়ার দেশগুলো প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলার লোকসানের মুখে পড়তে পারে। এই অনুমান থেকে এটি স্পষ্ট, ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন ঘটতে পারে।

সরকারের স্বাস্থ্য খাত

২০১২ সালে সরকারের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ২০ বছর মেয়াদি (২০১২-২০৩২ সাল) একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করে। এতে বলা হয়েছে, ব্যাক্তিপর্যায়ের চিকিৎসা ব্যয় পর্যায়ক্রমে কমিয়ে ২০৩২ সালে ৩২ শতাংশ করা হবে। বাকিটা সরকার বহন করবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ব্যয় তো কমছেই না, বরং দিন দিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২০ সালে এ ব্যয় বেড়ে ৬৯ শতাংশ হয়েছে, যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এ তথ্য থেকে বলা যায়, বাংলাদেশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্য অর্জনে অনেক পিছিয়ে পড়ছে। ২০১২ সালে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট কৌশলপত্র প্রণয়নের সময় ব্যাক্তির নিজস্ব চিকিৎসা ব্যয় ছিল ৬৪ শতাংশ। ২০১৫-২০১৭ সময় এ ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৬৭ শতাংশে। ২০২০ সালের গবেষণায় এই ব্যয় আরও বেড়ে হয়েছে ৬৮.৫ শতাংশ। তাই করোনাকালীন চিকিৎসা খরচ বহনে প্রবীণ নারী-পুরুষসহ সাধারণ মানুষ আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন এবং হচ্ছেন। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৯৭ সাল থেকে দেশে মোট স্বাস্থ্যব্যয়ে সরকারের ভাগ ক্রমান্বয়ে না বেড়ে বরং কমেছে। এতে হিমশিম খাচ্ছে রোগীর পরিবার।

২০১৭ সালের স্বাস্থ্যবিষয়ক এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ব্যক্তির স্বাস্থ্যব্যয় মালদ্বীপে ১৮, ভুটানে ২৫, শ্রীলংকায় ৪২, নেপালে ৪৭, পাকিস্তানে ৫৬ এবং ভারতে ৬২ শতাংশ। অথচ বাংলাদেশে এ ব্যয় সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ৬৮.৫ শতাংশ। অর্থাৎ বাংলাদেশেই ব্যক্তির স্বাস্থ্যব্যয় সবচেয়ে বেশি। এ কারণে স্বাস্থ্যব্যয় মেটাতে গিয়ে প্রতিবছর ৬০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাচ্ছে। গবেষকদের মতে, সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার তিনটি দিক রয়েছে । প্রথমত, প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনানুযায়ী রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। তৃতীয়ত, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের কারণে সৃষ্ট আর্থিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা। এসব লক্ষ্য অর্জন থেকে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে।

দুর্নীতির প্রভাব

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতির প্রভাব পড়েছে। গত অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় ৩৪১ কোটি টাকা বিতরণ সম্ভব হয়নি। ফলে দুঃস্থদের পুনর্বাসন কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটেছে। এ ছাড়া ৮৭ হাজার ভুয়া ভাতাভোগী চিহ্নিত হয়েছে। টিআইবির এক গবেষণায় বলা হয়েছে, সমাজসেবা কার্যালয়ের তথ্যভান্ডারে নাম অন্তর্ভুক্ত করতে ১০০ থেকে ২০০ শত টাকা ঘুষ দিতে হয়। এমনকি অতিদরিদ্র, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছ থেকেও ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা ঘুষ নেওয়া হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যক্রম সঠিক ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হলে বহু মানুষ করোনাপরবর্তী দুরবস্থা এবং দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে, সেই সাথে শ্লথ হয়ে পড়া অর্থনীতির গতি সচল হবে—এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

করোনায় প্রবীণ নারী ও পুরুষ

কোভিড-১৯ এ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত, বিপন্ন ও আক্রান্ত হয়েছেন প্রবীণ নারী ও পুরুষ। আমাদের পারিবারিক কাঠামো যৌথপরিবারভিত্তিক হলেও সময়ের পরিক্রমায় প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষাদীক্ষা, আকাশ সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে যৌথ পারিবারিক কাঠামো ধীরে ধীরে শিথিল হচ্ছে। তবে গ্রামীণ পরিবারগুলো এখনো যৌথভাবে চলছে। আমাদের সমাজব্যবস্থা পুরুষতান্ত্রিক। ফলে পরিবারের সর্বময়

কর্তা পুরুষ ব্যক্তি হওয়ায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তার ওপরই ন্যস্ত থাকে। কিন্তু সন্তান যখন বড় হয়ে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নেয়, তখন আর বৃদ্ধ মা-বাবার পরিবারে তেমন কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। গ্রামের কৃষকেরা করোনাকালীন উৎপাদন অব্যাহত রাখলেও লকডাউনের কারণে বাজারব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হওয়ায় অধিকাংশ পরিবারই বিশেষ করে প্রবীণ নারী পুরুষেরাই সবচেয়ে বেশি সমস্যায় দিন অতিবাহিত করেছেন। চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আমাদের দেশে অনেক প্রবীণ ব্যক্তি রয়েছেন, যারা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য সাধ্যমতো কোনো না কোনো কায়িক শ্রম করে থাকেন। এরপরেও তারা পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হন; বৃদ্ধ বয়সে যথাযথ চিকিৎসার অভাবে প্রাণ হারান, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই অবস্থা করোনায় আরও প্রকট হয়েছে। একইভাবে পরিবারে মহিলারা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কায়িক শ্রম দিয়ে পরিবারের সদস্যদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার চেষ্টা করলেও তাদের শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না, তারা পারিবারিক বা সামাজিক মর্যাদা পান না। উপরন্তু তারা বিভিন্নভাবে হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হন বেশি। আমাদের মতো দারিদ্র্যপ্রবণ দেশে খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান সমস্যাসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় প্রবীণ নারী ও পুরুষেরা এমনিতেই প্রতিনিয়ত জর্জরিত হচ্ছেন। করোনাকালীন প্রবীণ নারী ও পুরুষদের দুর্দশা সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁচেছে। তুলনামূলক বিশ্লেষণে প্রবীণ পুরুষদের চেয়ে প্রবীণ নারীরাই বেশি দুঃখ-কষ্ট-বিড়ম্বনার শিকার হয়েছেন এবং হচ্ছেন। অধিকাংশ প্রবীণ ব্যক্তিই অবহেলিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত ও বৈষম্যের শিকার।

দেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ প্রবীণ। এ দেশ এ সমাজের জন্য যারা একসময় বিরাট অবদান রেখেছেন, দেশের অর্থনীতিকে বর্তমান অবস্থানে নিয়ে আসার পেছনে যারা তাদের জীবন-যৌবন উৎসর্গ করেছেন, দেশ-সমাজ গড়ার কারিগর ছিলেন, সর্বোপরি পরিবারে যাদের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য— আজ তারা অপাঙ্‌ক্তেয়। তাদের কথা তেমন করে এ সমাজ বা পরিবার ভাবে না। মানবজাতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বার্ধক্য। বার্ধক্য মানবজীবনের প্রধান চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করে প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়ন, সমাজে প্রবীণদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর প্রতি সহনশীল আচরণ করার জন্য এবং এ সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৯৯১ সাল থেকে প্রতিবছর ১ অক্টোবরকে আর্ন্তজাতিক প্রবীণ দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। কিন্তু আক্ষরিক অর্থে কাজের কাজ কিছুই হয় না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের তথ্যানুসারে ২০৩০ সালে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ হবে প্রবীণ। ২০২৫ সালে এ সংখ্যা হবে ২ কোটি ৮০ লাখ এবং ২০৫০ সালে হবে প্রায় ৪ কোটি ৫০ লাখ প্রবীণ। আমাদের সমাজে প্রবীণরা অবহেলিত, নির্যাতিত এবং অপাঙ্‌ক্তেয়। অথচ আমরা অনেকে ভুলে যাই যে, বার্ধক্য প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। বেঁচে থাকলে বার্ধক্যের স্বাদ সবাইকে গ্রহণ করতে হবে। বার্ধক্য মানবজীবনের অনিবার্য পরিণতি। এ বাস্তবতা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু এই স্বাভাবিক নিয়মটা অধিকাংশ প্রবীণের জীবনে বয়ে আনে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট। আজ যারা নবীণ, তাদের অনেকেই প্রবীণদের যথাযথ সম্মান বা মর্যাদা প্রদর্শন করে না।

আমাদের সংবিধানে জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানসহ বেশ কয়েকটি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা আছে। কিন্তু বাস্তবে প্রবীণ জনগোষ্ঠী কি এসব মৌলিক অধিকার বা সুবিধাগুলো যথাযথভাবে পাচ্ছে বা ভোগ করছেন? বিজ্ঞানপ্রযুক্তি তথা চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নয়নের ফলে আমাদের গড় আয়ু বেড়ে যাওয়ায় একদিকে শিশুমৃত্যুর হার কমছে, অন্যদিকে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রতিনিয়তই বাড়ছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে উদ্বেগজনক অবস্থা হলো জনসংখ্যার বার্ধক্য। এটি আমাদের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। কিন্তু এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার কতটা প্রস্তুত? এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে

সরকারকে চলমান করোনা পরিস্থিতি, চিকিৎসা এবং দুর্মূল্যের বাজারকে বিবেচনায় নিয়ে প্রবীণদের জন্য উল্লেখযোগ্য হারে সার্বজনীন বয়স্কভাতা এবং সার্বজনীন চিকিৎসা সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে । শুধু তা-ই নয়, করোনার ক্ষতিকর মারাত্মক প্রভাব যে কতটা ভয়াবহ, মানুষকে কতটা পঙ্গু আর নিষ্ক্রিয় করে দেয়, করোনাপরবর্তী সময়ে এর জটিলতা শুধু তারাই উপলব্ধি করতে পারেন, যারা একবার করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাই করোনাপরবর্তী যারা বেঁচে আছেন, তাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণের জন্য বিশেষ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে সাথে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের বিষয়টিও সরকারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদান করতে হবে। তা না হলে কোভিড-১৯ এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আমরা দ্রুত সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পারব বলে মনে হয় না। এ বিষয়গুলো বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

বিশ্বে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১০০ কোটিতে পৌঁচেছে। অথচ ১৯৫০ সালে এ সংখ্যা ছিল মাত্র ২০ কোটি। বাংলাদেশে এ সংখ্যা এখন প্রায় দেড় কোটি। বাংলাদেশের মতো দারিদ্র্যপ্রবণ দেশে খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থানসহ বিভিন্ন সমস্যায় প্রবীণেরা প্রতিনিয়ত জর্জরিত হচ্ছেন। বিশেষ করে পুরুষ প্রবীণদের চেয়ে প্রবীণ নারীরা দুঃখ-কষ্ট-বৈষম্য-বিড়ম্বনার শিকার হন বেশি। সামাজিক ও পারিবারিক কারণে প্রবীণ নারীরা অর্থ-সম্পদহীন হওয়ায় শুধু জীবনের শুরুতেই নয় শেষ জীবনেও বিড়ম্বনার শিকার হন আরও বেশি। তাই তো করোনাকালীন প্রবীণ নারী ও পুরুষের দুরবস্থা সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এটি কমবেশি সবাই জানে। নতুন করে বলার কিছু নেই।

বর্তমান সরকার প্রবীণদের সার্বিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য ২০১৩ সালে পিতামাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩ ও প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মময় সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো বিগত আট বছরেও এ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি। এ নীতিমালা সম্পর্কে অনেকেই জানেন না। ১৯৮২ সালে প্রবীণবিষয়ক সম্মেলন ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল বার্ধক্য, স্বাস্থ্য সমস্যা, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা একাকীত্ব ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া। কিন্তু বাস্তবতা হলো ২০২১ সালে এসেও প্রবীণেরা তাদের সামাজিক মর্যাদা বা স্বীকৃতি পাচ্ছেন না। স্বাস্থ্যসুবিধা থেকে বঞ্চিত প্রবীণ নারী-পুরুষেরা করোনার প্রথম ধাপে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন। উন্নত বিশ্বের বড় দেশগুলো পৃথিবীতে হানাহানি করার জন্য আনবিক বোমাসহ বিভিন্ন ধরনের মারণাস্ত্র তৈরি করছে, কিন্তু বিগত দেড় বছর ধরে চলা এই অণুজীবের বিরুদ্ধে সত্যিকার অর্থে কোনো ওষুধ বা চিকিৎসা এখনো কেউ অবিষ্কার করতে পারছে না। ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছে, কিন্তু এটি আদৌ কোনো কাজ করছে বলে মনে হয় না। কারণ, করোনা মোকাবিলায় ডাবল ডোজ ভ্যাকসিন নিয়েও করোনা আক্রান্ত মৃত্যু ঠেকানো যাচ্ছে না। সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে এবং করছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এত উন্নতির পরও আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে।। মুখে মাস্ক পরে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরও আক্রান্ত হচ্ছে। করোনার ভয়ে পারিবারিক সামাজিক যোগাযোগসহ সব ধরনের যোগাযোগ, আনুষ্ঠানিকতা দীর্ঘদিন ধরে প্রায় বন্ধই ছিল। এখন পর্যন্ত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হতে সবসময় একটা আতঙ্ক, আশঙ্কা কাজ করে। এটি এমনই এক ভাইরাস, যা পারিবারিক-সামাজিক সামাজিকতাসহ সব বন্ধনকে নষ্ট করে দিয়েছে। পরিবারের স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো হত্যা করেছে। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস, আস্থা, ভালোবাসার জায়গাগুলো নড়বড়ে হয়ে গেছে। মানুষের দুর্দশা ও দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে হাসপাতালগুলো তাদের রমরমা ব্যবসার ফাঁদ পেতে বসেছে। আইসিইউতে রাখা রোগীর বিল দিতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা। যাদের আর্থিক সঙ্গতি ছিল

না তারা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেছে। বিরাট অংকের বিলের ভয়ে রোগীকে হাসপাতালে নিতেও স্বজনেরা দ্বিধাগ্রস্ত। সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষগুলো।

করোনা আমাদের অর্থনৈতিকভাবে অনেক দুর্বল করে দিয়েছে। দারিদ্র্যের হার আগের চেয়ে বেড়েছে। আয় বৈষম্য বেড়েছে। জীবনযাত্রার মানের অবনতি হয়েছে। অনেকের আয় রোজগার নেই। তার ওপর ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রীসহ প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত। বাজারে প্রতিটি পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। তারপরও চড়া মূল্য কেনা পণ্যের প্রায় সবটাই ভেজালে ভরা। ওষুধ ও চিকিৎসা ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জন্য চিকিৎসা এখন বিলাসিতায় পরিণত হয়েছে। জানা যায়, দেশে ৮৬ শতাংশ মানুষ চিকিৎসা নেয় বেসরকারি হাসপাতাল থেকে। বাকি ১৪.৪১ শতাংশ মানুষ সরকারি হাসপাতালে যায়। সরকারি হাসপাতালগুলো থেকে যথাযথ সেবা পায় না বলে চিকিৎসা ব্যয় বেশি হলেও নিরুপায় হয়ে বেসরকারি হাসপাতালে যেতে বাধ্য হয়। এ কারণে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে প্রতিবছর ৮৬ লাখেরও বেশি মানুষ আর্থিক দিক থেকে দুরবস্থার শিকার হচ্ছে। ফলে ৩ কোটিরও বেশি মানুষ প্রয়োজন হলেও চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে হাসপাতালে যান না বা যেতে পারেন না।

ব্রিটিশ সরকার এ দেশে সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য পেনশন প্রথা চালু করলেও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য কোনো ভাতা প্রচলন করেনি। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ সরকার দুস্থ ও বয়স্ক প্রবীণদের জন্য সার্বজনীন ভাতার প্রচলন করে এবং চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের বয়স ৫৭ থেকে ৫৯ বছর করে। সরকার দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য বয়স্কভাতার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এখানেও অনেক শুভঙ্করের ফাঁকি। এর বাইরে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির এবং অবসরপ্রাপ্ত যেসব প্রবীণ রয়েছেন, যারা অর্থকষ্টে পড়ে মানবেতর জীবন অতিবাহিত করছেন তাদের জন্য কী ব্যবস্থা রয়েছে? সমাজে অনেক দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রবীণ রয়েছেন, যারা তাদের মেধা, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা কাজে লাগিয়ে নিজের ও দেশের উন্নয়নে কাজ করতে চান—তাদের কথা সরকার ভাবছে না। অথচ আমাদের পাশ্ববর্তী দেশে অবসরপ্রাপ্ত দক্ষ, অভিজ্ঞ মেধাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের জাতীয়পর্যায়ে তালিকা করে 'মেনটর' হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া হয়। এতে করে তারা নিজেদের কর্মে নিয়োজিত করার পাশাপাশি পরিবার, সমাজ তথা দেশের উন্নয়নে কাজ করতে পারেন। সমাজে তারা আর বোঝা হিসেবে বিবেচিত হন না। মানসিক দিক থেকেও তারা আর নিজেদের পরিবার বা সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় বা বোঝা মনে করেন না। এসব দিক বিবেচনায় নিয়ে আমাদের সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে। দক্ষ, অভিজ্ঞ, কর্মঠ ও মেধাসম্পন্ন প্রবীণদের কাজে লাগাতে হবে। প্রবীণদের স্বাস্থ্যসুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে হাসপাতালগুলোতে প্রবীণ কর্নার স্থাপন এবং আসন বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। কারণ করোনাকালীন সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন এই প্রবীণ জনগোষ্ঠী। পাশাপাশি প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ বাস্তবায়নের দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে এবং পরিবার ও সমাজে প্রবীণদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা নিতে হবে। রেলসহ গণপরিবহণে প্রবীণদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে পৃথক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ জন্য সরকারিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। প্রবীণেরা সমাজে বোঝা নয়, তারা সম্পদ—এ বিষয়টি সবাইকে বোঝাতে হবে।

করোনার সময়ে নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান

ইউএনএফপিএ, ইউএন উইমেন এবং ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালের সমীক্ষা অনুসারে করোনার প্রভাবে আনুষ্ঠানিক খাতে বাংলাদেশের নারীদের কাজের সুযোগ কমেছে ৮১ শতাংশ। বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষার মতে, পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার ১৪ শতাংশ। আনুষ্ঠানিক খাতে ২৪ শতাংশ নারী কাজ করার সুযোগ হারিয়েছেন। আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নারীরাই বেশি কাজ করছেন। অর্থাৎ নারী উদ্যোক্তার সংখ্যাই সব থেকে বেশি। নারীরা ঘরে বসে স্বচ্ছন্দ্যে-নির্বিঘ্নে কাজ করেন। কিন্তু করোনা মহামারির কারণে ঘর থেকে বের হতে না পারায় যোগাযোগের অভাবে তারা তাদের কাজের সুযোগ হারিয়ে বিরাট আর্থিক সংকটে পড়েন। বিশেষ করে নারী নেতৃত্বাধীন পরিবারগুলোর দুর্দশা ছিল সীমাহীন। এর সাথে সাথে যুক্ত হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে সন্তানদের শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় এক অনিশ্চিত জীবনের আশংকায় দিন অতিবাহিত করা। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে সরকার ২০০ বিলিয়ন টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করলেও মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৫ শতাংশ, যা একবারেই অপ্রতুল।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পোশাক শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে এটা আমরা সবাই জানি। পাঁচ দশকের ব্যবধানে এই খাতের রপ্তানি আয় প্রায় ৯৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের অধিকাংশই নারী। প্রায় ৪০ লাখ গ্রামীণ নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন, সহযোগী শিল্পের বিকাশসহ অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছে এই পোশাক শিল্প। চীনের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রপ্তনিকারক দেশ হিসেবে রয়েছে বাংলাদেশ। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীর অবস্থান সুদৃঢ় করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে এই পোশাক শিল্প। অথচ করোনায় এই নারীকর্মীরা গৃহবন্দী হয়ে কেউ বা চাকরি হারিয়ে মানবেতর জীবন পার করছেন। করোনা সংকট মোকাবিলায় কর্মসংস্থানের জন্য ২ হাজার কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক। বাংলাদেশের শ্রমবাজারে এমনিতেই নারীর অংশগ্রহণ কম তার ওপর করোনার থাবা এই অংশগ্রহণ আরও সংকুচিত করেছে। আমাদের দেশে অনেক যোগ্য ও মেধাসম্পন্ন নারী ঘরের বাইরে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে চান। কিন্তু পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা এবং সন্তান দেখভালের অনিশ্চয়তার কারণে তা পারেন না। এ জন্য অর্থনৈতিক কাজে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সাথে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মতে, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বাণিজ্যিক খাতে পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কারণ নারীরা যে খাতগুলোতে বেশি নিয়োজিত সে খাতগুলোতেই করোনার প্রভাব বেশি পড়েছে। এ নিয়ে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কর্মসংস্থান বাড়াতে বিনিয়োগের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে শ্রমঘন শিল্পখাতে বেশি জোর দিতে হবে। তা না হলে জনশক্তি সম্পদ না হয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। সেইসাথে যেহেতু করোনায় প্রবীণ জনগোষ্ঠী ও নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেহেতু এই দুই শ্রেণির জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের মোট জনশক্তি ১৬ কোটি ৮২ লাখ। এর মধ্যে কর্ম উপযোগী মানুষের সংখ্যা ১০ কোটি ৯১ লাখ। কাজে নিয়োজিত আছেন ৬ কোটি ৮ লাখ মানুষ। বাকি ৪ কোটি ১১ লাখ মানুষ কাজের বাইরে আছেন বা বলা যায় বেকার। কৃষিতে নিয়োজিত আছেন ২ কোটি ৪৭ লাখ। যাদের বেশির ভাগই সারাবছর কাজ পান না। শিল্পে নিয়োজিত আছে ১ কোটি ২৪ লাখ এবং সেবা খাতে আছে ২ কোটি ৩৭ লাখ। করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই ৩টি খাতই, যাদের মধ্যে নারীশ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত জরিপে দেখা গেছে কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের প্রায় ৩৬ শতাংশ কর্মী কাজ হারিয়েছেন। এর মধ্যে ১৮

শতাংশ কাজে ফিরে যেতে পেরেছেন। বাকি ১৮ শতাংশ কাজে ফিরে যেতে পারেননি। করোনাপরবর্তী উল্লিখিত সমস্যাগুলো সমাধানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিলে কিছুটা হলেও হয়তো মানব উন্নয়ন সম্ভব হবে।

করোনাপরবর্তী অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায়-প্রতিকারসমূহ

১. করোনার প্রভাবে যারা চাকরি হারিয়েছেন, তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কর্মে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য করোনা-উত্তর দেশে বিনিয়োগে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. প্রণোদনার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সুষ্ঠুভাবে এবং যথাযথভাবে বিতরণ করতে হবে।

৪. করোনাকালীন হাসপাতালগুলোর সংকট মোকাবিলার জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। সারা দেশে হাসপাতালগুলোর আইসিইউর বর্তমান অবস্থার উন্নয়ন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এককথায় স্বাস্থ্য খাতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. প্রবীণ নারী-পুরুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি তথা মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে।

৬. প্রবীণদের কর্মে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি তাদের সার্বিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশসহ উন্নত দেশসমূহে সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে, আমাদের দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩ এবং প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ অবিলম্বে যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

৮. বয়স্ক ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র প্রবীণ ছাড়াও যেসব প্রবীণ ব্যাক্তি রয়েছেন, যারা বয়স্ক ভাতার আওতায় পড়েন না, তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯. প্রবীণ কল্যাণের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করে প্র্যাপ্যতা অনুযায়ী বণ্টন করতে হবে।

১০. ষাট বছর বা তদূর্ধ্ব ব্যক্তিদের সিনিয়র সিটিজেন কার্ড প্রদান এবং সরকারি-বেসরকারিপর্যায়ে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি প্রদান করতে হবে।

১১. প্রবীণ জনগোষ্ঠী ও দুস্থ মহিলাদের সুবিধাদি প্রদানের সাথে সাথে তা মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. নারীর পারিবারিক কাজের মূল্যায়ন করার পাশাপাশি তাদের শিক্ষা, সম্মান, ও মর্যাদা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩. গ্রামভিত্তিক বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ট মানুষ গ্রামে বাস করে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো, গ্রামের অধিকাংশ মানুষই স্বাস্থ্যসেবা থেকে প্রায় বঞ্চিত। এ জন্য গ্রামাঞ্চলে হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় সেবা, কর্মী ও উন্নতমানের যন্ত্রপাতি-উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. শুধু শহরকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা ও অবকাঠামো উন্নয়ন না করে গ্রামের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনানুযায়ী বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।

১৫. মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যমকে সোচ্চার হতে হবে এবং এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৬. করোনাপরবর্তী দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানব উন্নয়নের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিধি বাড়াতে হবে।

১৭. স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

১৮. ওষুধের সহজলভ্যতা, মূল্যহ্রাস ও চিকিৎসার মান নিশ্চিত করতে হবে।

১৯. গরিব ও নিম্ন আয়ের রোগীদের বিশেষ করে প্রবীণ নারী ও পুরুষদের বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে।

২০. সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালে আইসিইউ ও অস্ত্রপচারের অস্বাভাবিক চিকিৎসা ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে রোগীর নাগালের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

২১. স্বাস্থ্যখাতের দুর্নীতিসহ বিভিন্ন খাতের সীমাহীন দুর্নীতি রোধ করে করোনাকালীন বিপর্যস্ত জনজীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। দুর্নীতি জিরো টলারেন্সে আনতে না পারলেও সহনীয় পর্যায়ে আনার ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠাগুলোকে দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে।

২২. সর্বোপরি দুর্নীতিকে নির্মূল করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করার পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সে জন্য প্রয়োজন আইনের শাসন। এটি করতে পারলে একদিকে যেমন মানব উন্নয়ন সম্ভব হবে, তেমনি অন্যদিকে দেশের অথনীতিতে আবার গতিশীলতা ফিরে আসবে।

তথ্যসূত্র

বারকাত, আবুল (২০২০), *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে*, ঢাকা; বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা

বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা খণ্ড ৩৮, বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৭

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব: একটি জেন্ডার দৃষ্টিকোণ প্রতিবেদন থেকে সংগৃহীত তথ্য

দৈনিক যুগান্তর ০৯.১০.২০২১ সহ বিভিন্ন সময়ে প্রকশিত দৈনিক যুগান্তরসহ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত পত্রিকায় সংগৃহীত তথ্য ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জরিপ প্রতিবেদন ২০২০ ও ২০২১

সরকারের স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রতিবেদন ২০১৭

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ২০১২-২০৩২

দ্য ওয়ার্ল্ড ইনইক্যুয়ালিটি রিপোর্ট